ড. রাগিব সারজানি

আমরা আবরাহার যুগে নই

অনুবাদ

মাহদি হাসান

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

।। উৎসর্জন ।।

ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, সিরিয়া, চেচনিয়া, মায়ানমার, কাশ্মীর, উইঘুর এবং পৃথিবীর আনাচে কানাচে সকল নিপীড়িত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। এই কামনায়— যেন মুসলমানদের চেতনার প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় আবার। তবেই নেমে আসবে আল্লাহ তাআলার সাহায্য। মুসলমানরা আবার হবে বিশ্বের অধিপতি।

—মাহদি হাসান

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

মনে কি পড়ে সেই আসহাবুল ফিল তথা হস্তীবাহিনীর গল্প? ইয়ামানের দাম্ভিক শাসক আবরাহা আল-আশরাম রাজধানী সানায় নির্মাণ করেছিল একটি বিরাট গির্জা। সে চেয়েছিল, লোকেরা যেন মক্কায় না গিয়ে এখানেই হজ করে। কিন্তু তারা তাকে নিরাশার বালিয়াড়িতে নিক্ষেপ করে। তাই সে তার হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়। তার ইচ্ছা ছিল পবিত্র কা'বা শরিফকে ধ্বংস করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার অবধারিত রীতি অনুযায়ী সমূলে ধ্বংস করে দেন আবরাহার বাহিনীকে। যেমনিভাবে তিনি ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছিলেন আরও অনেক অত্যাচারী সম্প্রদায়কে। আল্লাহ তাআলা আবরাহার বাহিনীর উপর প্রেরণ করলেন 'তাইরান আবাবিল' তথা 'ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল'। তারা তাদের চঞ্চু থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল হস্তীবাহিনীর সৈন্যদের দেহ। সেখানেই লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল আবরাহার।

আবরাহার গল্প আমাদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা। এই ছিল সর্বশেষ ঘটনা, যেখানে

আল্লাহ তাআলা বিপর্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে হকের শত্রুদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর জন্ম নেন আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার জন্মের সাথে সাথে পাল্টে যায় আল্লাহ তাআলার সেই অবধারিত রীতি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্য আল্লাহ প্রবর্তন করেন এক নতুন রীতি। তিনি বলেন,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।"[১]

আমরা আবরাহার যুগে নই। আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে। তাই আল্লাহ তাআলার সাহায্য পেতে হলে আমাদের আল্লাহকেও সাহায্য করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলাকে কিভাবে সাহায্য করা যায়? তিনি কি সাহায্যের মুখাপেক্ষী?

---

১. সুরা মুহাম্মদ : ৭

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ তাআলাকে সাহায্য করার মাধ্যম হলো নেক আমল করা। জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারাজীবন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাই তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহ তাআলার সাহায্য। কখনো ফেরেশতাদের রূপে, কখনো ঘূর্ণিঝড়ের রূপে, আবার কখনো কাফেরদের অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া ভয়-ভীতির রূপে।

তবে এ সাহায্য পেতে হলে মুসলমানদের জন্য অগ্রিম কিছু কাজ করা আবশ্যক। নিজেদেরকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং আত্মরক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এরমধ্যে অন্যতম। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো আমরা বর্তমানে এসবের ধারেকাছেও নেই। ফলে বিশ্বের আনাচে কানাচে অহরহ নিপীড়িত হচ্ছে মুসলমান। আমরা সেগুলো শুধু দূর থেকেই অবলোকন করে ক্ষান্ত থাকছি। হাত গুটিয়ে বসে থাকছি ঘরের কোণে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. যেমন মুরতাদদের কাছ থেকে জমিন পবিত্র করেছিলেন, ক্রুসেডারদের দখলদারিত্ব থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র ভূমি উদ্ধার করেছিলেন

মহাবীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবি, রক্তপিপাসু তাতারীদের রক্ত বন্যা থামিয়ে দিয়েছিলেন বীর সেনা সাইফুদ্দিন কুতুজ; তাদের মতো করে আর কোনো মহাবীরের আবির্ভাব হয় না এখন। উম্মাহর চেতনায় বাসা বেঁধেছে আজ ঘুণেপোকার দল। তারা ঘরের কোণে বসে থেকে শত্রুদের উপর আজাব নেমে আসার প্রতীক্ষা করছে। তারা উপলব্ধি করছে না যে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য পেতে হলে তাদের পক্ষ থেকেও কোনো না কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তাই উম্মাহর হারানো চেতনাকে পুনুরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ড. রাগিব সারজানি তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন সে সকল ভাবনা, উম্মাহ তার প্রতিটি পদক্ষেপে যেগুলোর প্রতি প্রবলভাবে মুখাপেক্ষী। আমি আশাবাদী, আকণ্ঠ হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া মুসলিম জাতির জন্য বইটি হবে চেতনার দিশারি।

বইটি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে, মুসলিম জাতি কখনোই ধ্বংস হবে না। তারাই একমাত্র রিসালাত বহনকারী জাতি। আল্লাহ তাআলার রিসালাতকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিতে তাদের টিকে থাকার বিকল্প নেই।

সর্বশেষ ক্ষমতার লাগাম তাদের হাতেই থাকবে।

বইটি আমাদের আরও জানিয়ে দিচ্ছে, বর্তমান মুসলিমদের উপর নেমে আসা আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যবাদী অভিশাপ অচিরেই সমূলে ধ্বংস হবে। অতিশীঘ্রই তারা আল্লাহ তাআলার অবধারিত রীতির মুখোমুখি হবে।

এছাড়াও বইটিতে আরও রয়েছে মুসলিম উম্মাহর জাগরণের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। তাই ঘুণেধরা চেতনাধারী, হতাশাগ্রস্ত মুসলিম জাতির জন্য বইটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

মাহদি হাসান

সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। আমরা তার প্রশংসা করি। তার কাছেই সাহায্য চাই। তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। তার কাছেই সুপথ কামনা করি। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট এবং মন্দ কর্ম হতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যাকে সুপথে চালিত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আর যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ সুপথে চালিত করতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, তিনিই একক সত্তা, তার কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা এবং প্রেরিত রাসুল। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহমত বর্ষণ করুন, তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবাগণের প্রতিও রহমত বর্ষণ করুন। আর তাদের উপর বর্ষণ করুন অফুরান শান্তি।

হামদ ও সালাতের পর...

প্রতিটি মানুষই আবরাহার গল্প সম্পর্কে জানেন। এ হচ্ছে সেই আবরাহা আল-আশরাম, যে তার সৈন্যসামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইয়ামান থেকে

পবিত্র কা'বা শরিফ ধ্বংস করার জন্য এসেছিল। প্রতিটি মানুষই এ কথা জানেন।

মক্কায় আগমন করার পথে সে মক্কাবাসীদের কিছু উট হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যার মধ্যে ছিল প্রায় দুইশত উট। এরপর সে মক্কায় প্রবেশ করার পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে।

আবরাহা মক্কায় প্রবেশের পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা এবং তৎকালীন মক্কার নেতা আবদুল মুত্তালিব এর মুখোমুখি হয়। আবদুল মুত্তালিব মক্কায় প্রবেশের পূর্বে আবরাহার সাথে বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন।

আবরাহা তাকে দেখে অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাকে তার পাশে নিয়ে বসায়। তার দ্বারা সে বেশ প্রভাবিত হয়। সে আবদুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞাসা করে—বলুন, আপনার কী প্রয়োজন? কেন এসেছেন?

আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমার প্রয়োজন হলো, আপনি আমার যে দুইশত উট দখল করেছেন সেগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিন!

আবরাহা ভেবেছিল আবদুল মুত্তালিব বাইতুল্লাহর ব্যাপারে কোন আবেদন করবেন। তাই আবরাহা তাকে বলল, আপনি প্রথম দর্শনেই আমাকে মুগ্ধ করেছেন। তবে আপনার সাথে কথা বলার পর

আমার মনে আপনার জন্য আর কোনো মর্যাদা অবশিষ্ট রইল না।

আবরাহা আবদুল মুত্তালিবকে বেশ তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখল। কেননা, তিনি দুইশত উট নিয়ে কথা বলছেন আর পবিত্র বাইতুল্লাহর কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন!

আবরাহা বলল, আপনি আমার কাছে নিজের দুইশত উট ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালেন। আর আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল বাইতুল্লাহ সম্পর্কে কিছুই বললেন না! অথচ আমি তা ধ্বংস করতে এসেছি।

তখন আবদুল মুত্তালিব এমন একটি বাক্য বললেন যার প্রেক্ষিতে অনেকেই বলে থাকেন যে, এই বাক্যটি খুব সুন্দরভাবেই আল্লাহ তাআলার প্রতি তার বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে।

তিনি বললেন, আমি তো হচ্ছি উটের মালিক। আর নিশ্চয়ই এই ঘরেরও একজন মালিক আছে। অবশ্যই তিনি তা রক্ষা করবেন।

আপাতদৃষ্টিতে আবরাহার সাথে আবদুল মুত্তালিব এর এই কথোপকথনকে অবিবেচনাপ্রসূত বলেই মনে হয়।

কোনো মানুষ কি আল্লাহ তাআলার ধর্মকে আল্লাহ তাআলার হাতে রক্ষা করার জন্য ছেড়ে দিয়ে শুধু

নিজের জীবন, বেঁচে থাকার মতো খাদ্য, সন্তানসন্ততি, উটের পাল এবং ভোগবিলাসের বস্তুর পেছনে ছুটে কাটিয়ে দিতে পারে?

সত্য কথা হচ্ছে, যদি কেউ এমনটি ভেবে থাকে, তাহলে এটি তার বুদ্ধিমত্তার অসম্পূর্ণতা এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থেকে সৃষ্ট।

যাইহোক, মক্কাবাসীর এমন নেতিবাচক অবস্থান, পাহাড়ের উপত্যকায় আশ্রয় নিয়ে আবরাহার হস্তীবাহিনীকে মক্কায় প্রবেশ করার অবারিত সুযোগ করে দেওয়ার পরও সেই বাহিনীর উপর অবতীর্ণ হলো ছোট ছোট পাখির ঝাঁক! প্রকাশ পেল আল্লাহ তাআলার এক বিরাট মুজিযা। ছোট ছোট পাখিগুলো পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল। যার ফলে আবরাহার বাহিনী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের আস্ফালন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এই পাখির ঝাঁক আগমন করল কেন? এমন নেতিবাচক মনোভাব পোষণকারী জাতির সাহায্য করতে তারা কেন ছুটে এলো?

উত্তর হলো, এটিই আল্লাহ তাআলার অবধারিত রীতি। এভাবেই তিনি অত্যাচারীদের ধ্বংস করে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আল্লাহ তাআলা এমনিভাবেই অত্যাচারীদের ধ্বংস করতেন।

আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীদের লণ্ডভণ্ড করে দিতেন। এর জন্য মুমিনগণকে তরবারি উত্তোলন করা এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজনও হতো না।

যখন পবিত্র বাইতুল্লাহকে বিপদ ঘিরে নিল তখন মুমিনদের অনুপস্থিতিতেই আল্লাহ তাআলার এ রীতির প্রয়োগ ঘটে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও এমন ঘটনা ঘটেছিল।

হজরত নুহ আলাইহিস সালামের যুগে

হজরত নুহ আলাইহিস সালামের জাতি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। একপর্যায়ে তিনি অনুধাবন করলেন যে, তাদের ঈমান গ্রহণের আর কোনো আশা অবশিষ্ট নেই। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনায় রত হয়ে যান।

পবিত্র কুরআনের আয়াতে বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে এভাবে—

﴿فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ﴾

"অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল, নিশ্চয়ই আমি অক্ষম, অতএব তুমি সাহায্য করো।"[২]

আল্লাহ তাআলা তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং বললেন,

﴿فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝ وَّ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُیُوْنًا فَالْتَقَی الْمَآءُ عَلٰۤی اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ وَ حَمَلْنٰهُ عَلٰی ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍ﴾

---

২. সুরা কমার : ১০

"তখন আমি প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে আকাশের দ্বার খুলে দিলাম এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। ফলে সব পানি এক পরিকল্পিত কাজে মিলিত হলো। এবং আমি নুহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে"।[৩]

এখানে মুমিন এবং কাফেরদের মাঝে কোনো সংঘর্ষ হয়নি; বরং সংঘটিত হয়েছিল এক মহাপ্লাবন। এ বিপর্যয়ের হাত থেকে আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে উদ্ধার করেছেন।

হজরত লুত আলাইহিস সালামের যুগে

হজরত লুত আলাইহিস সালামের গোত্র তাকে অস্বীকার করলে তিনি বললেন,

﴿رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ﴾

"হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা করো"।[৪]

---

[৩]. সুরা কমার : ১১-১৩

[৪]. সুরা শু'আরা : ১৬৯

অতঃপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ অবতীর্ণ হলো,

﴿فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ اتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّ امْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ﴾

"অতএব, আপনি শেষরাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন না এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশপ্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে চলে যান"।[৫]

এখানেও কোনো প্রকার সংঘর্ষ ঘটেনি। অতঃপর লুত আলাইহিস সালাম বেরিয়ে গেলে সেই অনাচারী গ্রামবাসীর কী পরিণতি হয়েছিল তা আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন,

﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ﴾

"অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম"।[৬]

---

৫. সুরা হিজর : ৬৫

৬. সুরা হিজর : ৮৪

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের যুগে

বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং একটি নতুন জাতি তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মিসরে যখন তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলা হলো এবং ফেরআউন ও তার জাতির ঈমান আনয়নের ব্যাপারে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম নিরাশ হয়ে পড়লেন তখন তিনি বললেন, যেমনটি তার ভাষায় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ﴾

"হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আজাব প্রত্যক্ষ করে নেয়"।[৭]

তখন ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হলো,

﴿فَاَسْرِ بِعِبَادِیْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ﴾

---

[৭]. সুরা ইউনুস : ৮৮

> "সুতরাং, তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বের হয়ে পড়ো। নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে"।[৮]

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের জাতি এবং ফেরআউনের মাঝে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। হজরত মুসা আলাইহিস সালামের জাতিকে ফেরআউন এবং তার বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। তাদেরকে শুধু মিসর থেকে অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদেশ পেয়ে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং বনি ইসরাইলের সঙ্গী-সাথিরা চলতে লাগলেন। অবশেষে তারা এসে উপনীত হলেন সমুদ্রতীরে। সেখানে এসে তারা মুক্তির আশা হারিয়ে ফেলল। তারা দেখছিল, পেছনেই ধেয়ে আসছে ফেরআউনের সেনাবাহিনী। আল্লাহ তাআলা এ ঘটনাকে পবিত্র কুরআনুল কারিমে এভাবে চিত্রিত করেছেন,

﴿فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ○ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ﴾

> "যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল তখন মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী-সাথিরা বলল,

---

[৮]. সুরা দোখান : ২৩

নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়ে যাব। মুসা বললেন, কখনো না, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সাথে আছেন, অচিরেই তিনি আমাকে মুক্তির পথ দেখাবেন"।[৯]

এমন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে মুসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে ব্যক্ত হয়েছিল আল্লাহ তাআলার প্রতি আস্থাশীল একটি বাক্য।

আর তা হচ্ছে,

﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ﴾

"কখনো না, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সাথে আছেন, অচিরেই তিনি আমাকে মুক্তির পথ দেখাবেন"।[১০]

কিন্তু বনি ইসরাইলের অবশিষ্ট লোকেরা ফেরআউনের সেনাবাহিনীকে দেখে ভীষণ সংশয়ে নিপতিত হলো। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِO وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَO وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَجْمَعِيْنَ﴾

[৯]. সুরা শু'আরা : ৬১-৬২
[১০]. সুরা শু'আরা : ৬২

"অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করো। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আর আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম এবং মুসা ও তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম"।[১১]

সেখানে কোনো প্রাণোৎসর্গ করা অথবা কারও শহিদ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। বনি ইসরাইলের প্রত্যেকেই মুক্তি পেয়ে যায়। যদিও তারা বলেছিল যে,

"নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়ে যাব"।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ﴾

"অতঃপর আমি অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম"।[১২]

সুতরাং অত্যাচারী ফেরআউনকে দুর্যোগে নিপতিত করে ধ্বংস করা হলো। আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে বিদীর্ণ করলেন এবং ফেরআউনকে ধ্বংস করে দিলেন। অভিসম্পাত বর্ষিত হোক তার উপর এবং তার সঙ্গে থাকা সৈন্যদের উপর।

---

[১১]. সুরা শু'আরা : ৬৩-৬৫

[১২]. সুরা শু'আরা : ৬৬

সত্যের বিপরীতে অবস্থানকারী এবং অত্যাচারীদের সাথে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে পূর্বেকার প্রতিটি যুগেই এ ছিল আল্লাহ তাআলার অবধারিত রীতি। আবরাহার সময়ে এসেও আমরা এমন চিত্রেরই দেখা পাই।

কিন্তু আবরাহার ঘটনার মাত্র পঞ্চাশ দিন পরেই আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীদের ধ্বংসকল্পে এক নতুন পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। সেই নতুন পদ্ধতির দ্বার উন্মোচন করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণ। আবরাহার ঘটনা ছিল সর্বশেষ ঘটনা যেখানে দুর্যোগের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যের আগমন ঘটেছিল।

তবে অত্যাচারীদের ধ্বংস করার রীতি এখনও বহমান রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَ خَافَ وَعِيْدِ﴾

“কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত পয়গম্বরগণকে বলেছিল, অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়ন করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে (পয়গম্বরগণের কাছে)

তাদের পালনকর্তা ওহি প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। তাদের পর তোমাদেরকে দিয়ে জমিনে আবাদ করাব। এ পুরস্কার তারাই পাবে, যারা আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে"।[১৩]

অর্থাৎ, এমন জাতি যারা আল্লাহ তাআলার সামনে অবস্থান করাকে ভয় করে, তার শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে, সর্বশেষে ক্ষমতা অবশ্যই তাদের হাতে থাকবে। আর তাদের বিরোধী অত্যাচারীরা অবশ্যই ধ্বংস হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সাথে সাথে যা পরিবর্তিত হয়েছে তা হলো ধ্বংসের পদ্ধতি। পূর্বযুগে অত্যাচারীরা ধ্বংস হতো দুর্যোগের মাধ্যমে। কিন্তু নবীজির জন্মের পর নতুন ধর্ম তথা ইসলাম ধর্মের রীতি হচ্ছে,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য

---

[১৩]. সুরা ইবরাহিম : ১৩-১৪

করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।” [১৪]

মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে একনিষ্ঠ এবং নবুয়তের আলোকে বিশুদ্ধ আমল পেশ করা।

যখন মুসলমানরা আমল পেশ করবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁকের ন্যায় কোনো সাহায্য পাঠাবেন।

মুমিনগণের উপর অবতীর্ণ করবেন বরকত, রহমত, নিরাপত্তা, দৃঢ়তা এবং তাওফিক। আর কাফেরদের উপর চাপিয়ে দেবেন ক্রোধ, কষ্ট এবং শাস্তি।

মনে রাখতে হবে আমল ব্যতীত কখনোই এমন পাখির ঝাঁক অবতীর্ণ হবে না।

চেষ্টা, শ্রম এবং দান ব্যতীত এই ধরনের পাথরের কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হবে না। শুধু মুসলিমদের জন্যই এই নতুন রীতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এ রীতি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বহাল থাকবে। এতে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

---

[১৪]. সুরা মুহাম্মদ : ৭

"তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।"[১৫]

অনেক মানুষ এমন আছে যারা অত্যাচারীদের দেখে ভীত হয়ে যায়। কিন্তু তারাই আবার মুমিনদের গর্দান চেপে ধরতে ঠিকই উদ্যত হয়। তারা দূরবর্তী অথবা প্রায় অসম্ভব আশা বুকে নিয়ে বসে থাকে যে, তাদের সাহায্যে কাফেরদের উপর (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁক অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। ফলে মুসলমানরা দূর থেকেই অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করে যায়!!

এটা ভুল পদ্ধতি। এটা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় এবং আল্লাহ তাআলার রীতি পরিবর্তনের বিষয়টি বুঝতে না পারার ফলেই এমনটি হয়ে থাকে।

মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে নিজেদের উপর, নিজেদের বাহুবলের উপর এবং তাদের শরিয়ত ও জীবন চলার পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল হওয়া।

মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল হওয়া।

---

[১৫]. সুরা মুহাম্মদ : ৭

আর আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরতা সেভাবেই হতে হবে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা চান। আমাদের প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়ে আমরা যেমনটি চাই তেমন না।

আল্লাহ তাআলা রীতি পরিবর্তন করতে গিয়ে আমাদের জন্য স্পষ্ট পদ্ধতি নির্ণয় করে দিয়েছেন। তবে মুসলমানদের জীবনযাপনের অবস্থাভেদে সে পদ্ধতিতে সামান্য তারতম্য হতে পারে।

কখনো কখনো মুসলমানদের জন্য শুধু দুআই যথেষ্ট হবে। এই দুআ কখনো গোপনে হবে, আবার কখনো প্রকাশ্যেও হবে।

কখনো মুসলমানদের চুক্তির প্রয়োজন হবে, আবার কখনো প্রয়োজন হবে জিহাদের। কখনো তারা এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে, আবার আরেক জাতির সাথে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।

আবার কখনো তারা সমস্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে।

এমনিভাবে অবস্থাভেদে পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে।

কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই মুসলমানদের জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যে জাতি অলস, যে জাতি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, যে জাতি নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করে—তাদের উপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য অবতীর্ণ হবে না।

এ জন্যই কিছু কিছু মানুষ যে দুআ করে বলে,

> "হে আল্লাহ, আপনি অত্যাচারীদের মাধ্যমে অত্যাচারীদের ধ্বংস করুন এবং তাদের মধ্য থেকে আমাকে নিরাপদে মুক্ত করে আনুন"।

এই দুআয় আমি আশ্চর্যবোধ করি না। তাহলে এখন আপনার ভূমিকা কী? আপনি কি শুধু দেখে দেখেই ক্ষান্ত থাকবেন? আর ভাবতে থাকবেন যে, এ সকল ঘটনাবলি দর্শনের মাধ্যমেই আপনি নেতৃত্ব, ক্ষমতা, সম্মান এবং সাফল্যের শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারবেন? এটা ভুল, এটা আল্লাহ তাআলার রীতি নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার রীতি হচ্ছে—

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ﴾

> "হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।"[১৬]

আর একটি কথা মনে রাখবেন, আমরা আবরাহার যুগে নই...

---

১৬. সুরা মুহাম্মদ : ৭

আবরাহার যুগের পর আর কখনোই অত্যাচারীদের উপর (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁক নেমে আসবে না। যদিও (কুরাইশদের মতো) সৎলোকগণ তাদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকার মিসাইল, জঙ্গী বিমান, কামান এবং গ্রেনেডগুলো মুসলিম দেশসমূহে আঘাত হানছে। আর মুসলমানরা তাদের দেশ এবং ঘর-বাড়ি ধ্বংস করতে আসা সৈন্যদেরকে হতাশার দৃষ্টিতে শুধু দেখেই যাচ্ছে। শত্রুরা একের পর এক তাদের সন্তান, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং স্ত্রীদেরকে হত্যা করে যাচ্ছে। অথচ তারা ভেবে বসে আছে যে, তারা কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। তারা প্রতীক্ষার প্রহর গুনে, হয়তো আল্লাহ তাআলা দলে দলে পাখির ঝাঁক অবতীর্ণ করবেন অথবা প্রস্তরবৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন।

হয়তো আল্লাহ তাআলা কোনো মুজিযা দেখিয়ে দেবেন।

হয়তো তিনি শত্রুদেরকে কোনো দুর্যোগে নিপতিত করবেন।

যারা এমন বিশ্বাস রেখে বসে আছে,

যারা আমেরিকার বোমারুদের উপর বজ্রপাত হওয়ার প্রতীক্ষায় বসে আছে,

যারা কুয়েত, সৌদি আরব, কাতার, আম্মান, তুরস্ক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং উজবেকিস্তানে ঘাঁটি পেতে থাকা আমেরিকান সৈন্যদের উপর ভূমিকম্প হওয়ার অপেক্ষায় আছে,

আর যারা আরব প্রণালি, ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর, পীত সাগর এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে অবস্থানকারী আমেরিকান নৌবহরের উপর ঝড় আপতিত হওয়ার আশায় বসে আছে,

তাদের সকলের প্রতি লক্ষ করে আমি বলব, তোমাদের প্রতীক্ষার প্রহর ক্রমেই প্রলম্বিত হতে থাকবে।

পদক্ষেপ নেওয়া ব্যতীত কখনোই (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁক অথবা তার সদৃশ কোনো শাস্তি আসমান থেকে অবতীর্ণ হবে না।

আল্লাহ তাআলার রীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।" [১৭]

---

[১৭]. সুরা মুহাম্মদ : ৭

হে আমার দ্বীনি ভাই,

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তার প্রেরিত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা প্রিয় নই। অথচ জীবনের পুরোটা সময়েই তার সাথে আল্লাহ তাআলার এ রীতি বহাল ছিল।

বদরের যুদ্ধে

কাফেরদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রজন্ম, যাদেরকে এ উম্মতের ফেরআউন বলে আখ্যা দেওয়া হয়, তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। সেই শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তা সত্ত্বেও কাফেরদের এবং মুসলমানদের মধ্যকার সংঘর্ষ রুখে দেওয়ার জন্য কাফেরদের উপরে কোনো পাখির ঝাঁক নেমে আসেনি। বরং চিত্র ছিল এর বিপরীত। প্রতিটি পরিস্থিতিই ক্রমান্বয়ে তাদেরকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। যদিও যুদ্ধের প্রতি দু'পক্ষেরই ছিল অনাগ্রহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾

"এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা এক সঙ্গে সে

ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা ছিল পূর্ব নির্ধারিত”।[১৮]

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾

“আর যখন তোমরা মুখোমুখি হলে তখন তাদের দেখালেন তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে বেশি, যাতে আল্লাহ তাআলা সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল পূর্বে নির্ধারিত। আর সকল কাজই আল্লাহ তাআলার নিকটে গিয়ে পৌঁছায়”।[১৯]

তাই সেখানে আবশ্যিকভাবেই সংঘর্ষ হয়েছিল। সংঘর্ষের পূর্বে (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁক নেমে আসেনি।

যদিও মুমিনদের সৈন্যবাহিনী আল্লাহ তাআলার কাছে আবরাহার সময়কার মক্কার অধিবাসীদের চেয়ে হাজার

---

[১৮]. সুরা আনফাল : ৪২

[১৯]. সুরা আনফাল : ৪৪

গুনে সম্মানিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নতুন এক স্থায়ী রীতি প্রবর্তন করলেন,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।"[২০]

ফলে (শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য) আবশ্যক ছিল উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা, উত্তমরূপে পরামর্শ করা, কাতার সুবিন্যস্ত করা, মুমিনদের অন্তরসমূহের মাঝে সৌহার্দ্য স্থাপন, তরবারি উত্তোলন, দৃঢ় পরিকল্পনা, অনবরত দুআ করা, অটল থাকা এবং আঘাত ও যন্ত্রণা সহ্য করা, রক্তপাত ঘটানো এবং শহিদ হওয়া।

যখন এগুলো বাস্তবায়িত হবে তখন অবশ্যই (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁকের ন্যায় সাহায্য অবতীর্ণ হবে। সেই সাহায্য আগমন করবে ফেরেশতাদের আকৃতিতে, বৃষ্টিরূপে, কাফেরদের অন্তরে উদ্রেক হওয়া ভীতির আকারে, দ্বীনের শত্রুদের কাতারের মাঝে পার্থক্য এবং বিচ্ছিন্নতার আঙ্গিকে।

---

[২০]. সুরা মুহাম্মদ : ৭

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা যেভাবে চান সেভাবেই সাহায্য অবতীর্ণ হবে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কাছে আমল পেশ করা আবশ্যক, আরও আবশ্যক কোনো না কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তাআলার ডাকে সাড়া দেওয়া।

খন্দকের যুদ্ধে

এ যুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবিদের সাথে লড়াইকারী কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা ছিল দশহাজার।

ইসলামকে নির্মূল করে দেওয়ার হুমকি নিয়ে তারা এসেছিল। মদিনা মুনাওয়ারা ছিল পরিপূর্ণ হকের ঘাঁটি। তার চারপাশকে ঘিরে নিয়েছিল বাতিল শক্তি। এ যুদ্ধেও কাফেরদের সৈন্যদলের উপর (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁক নেমে আসেনি। তাদের উপর আপতিত হয়নি কোনো ভূমিকম্প অথবা ঘূর্ণিঝড়, কিংবা কোনো ঝঞ্ঝাবায়ু বা মহাপ্লাবন। এখানেও আল্লাহ তাআলার রীতি ছিল এমন...

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য

করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।"[২১]

ফলে (শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য) আবশ্যক ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা, মুমিনদের মাঝে ঐক্য থাকা, উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ, গর্ত খনন, ক্ষুধার উপর ধৈর্যধারণ, জোট গঠন, কাফের এবং মুশরিকদের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, উত্তম পন্থায় মল্লযুদ্ধে নামা এবং যোগাযোগ শক্তি স্থাপন করা।

এসবের পাশাপাশি আরও আবশ্যক ছিল সুস্থ আকিদা-বিশ্বাস রাখা এবং সঠিক পন্থায় আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা।

যখন এ সকল বিষয়ের সমন্বয় ঘটবে, তখনই আল্লাহ তাআলার অটল বান্দাদের উপর তার সাহায্য অবতীর্ণ হবে।

নেমে আসবে (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁক অথবা তার সদৃশ কোনো সাহায্য।

সেগুলো নেমে আসবে প্রবল বাতাসের রূপ ধরে, মুশরিক ও ইহুদিদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে,

---

[২১]. সুরা মুহাম্মদ : ৭

তাদের মধ্যে ভয়-ভীতির উদ্রেক হয়ে এবং কঠোর সিদ্ধান্তের আকৃতিতে।

তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে, আগে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। এমন সব আমলও করতে হবে, যা সর্বদা করা হয় এবং যে আমলে অনেক নেকি হয়। যে আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার জন্যই হয়ে থাকে।

এর বিপরীতে...

অহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা কাফেরদের কাছে পরাজিত হয়। কেননা, তখন তারা এই রীতির বিরোধিতা করেছিল।

আল্লাহ তাআলা তার রাসুল এবং মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

﴿أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَٰذَا﴾

"যখন তোমাদের উপর বিপদ নেমে এলো, অথচ ইতিপূর্বে এর দ্বিগুণ বিপদে তোমরা পড়েছিলে, তখন তোমরা বললে, এটা কোথা থেকে এলো?"[২২]

---

[২২]. সুরা আল-ইমরান : ১৬৫

ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হয়েছ। আর এখন পরাজয়বরণ করে তোমরা বলছ, এটা কোথা থেকে এলো?! মুশরিকদের কাছে কীভাবে পরাজিত হলো তা ভেবে মুসলমানরা বিস্ময় বোধ করতে থাকে। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলে দিলেন,

﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আপনি বলে দিন, এ কষ্ট তোমাদের কারণেই এসেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান"।[২৩]

অহুদের যুদ্ধে পাহাড় থেকে তিরন্দাজরা সরে পড়ে শুধু যুদ্ধকৌশল-সংক্রান্ত ভুলই করেনি; বরং তারা অন্তর্নিহিত বিপজ্জনক এক বিরোধিতায়-ও পতিত হয়েছিল। তাদের প্রতি লক্ষ্য করেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾

"তোমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ পার্থিব ভোগ-বিলাস কামনা করে"।[২৪]

এ যুদ্ধেও মুসলমানদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংসকারী) পাখির ঝাঁক নেমে

---

[২৩]. সুরা আল-ইমরান : ১৬৫
[২৪]. সুরা আল-ইমরান : ১৫২

আসেনি। কেননা আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য যে রীতি প্রবর্তন করেছেন তা হচ্ছে,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।" [২৫]

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, আমরা আবরাহার যুগে নই; বরং আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অবস্থান করছি।

আর আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্য যে রীতি প্রবর্তন করেছেন তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রীতি এবং আমাদেরকে তা মেনেই চলতে হবে।

তাহলে আমাদের এখন কী করণীয়?

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ যে অবস্থায় তাদের দিন যাপন করছে এমতাবস্থায় কী করণীয়?

ইরাক যে ট্র্যাজেডির মাঝ দিয়ে অতিক্রম করছে—এ অবস্থায় কী করা উচিত?

---

[২৫]. সুরা মুহাম্মদ : ৭

ফিলিস্তিন যে সকল বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?

চেচনিয়ার উপর দিয়ে যে বিপর্যয় অতিবাহিত হচ্ছে এমতাবস্থায় আমাদের কী করার আছে?

কাশ্মীর, বসনিয়া, কসোভো, ফিলিপাইন, মায়ানমার, আফগানিস্তান, সুদান, লিবিয়া প্রভৃতি মুসলিম দেশসমূহে মুসলমানদের উপর যে অত্যাচারের স্টিম রোলার চলছে তা প্রতিরোধে আমাদের কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

নিশ্চয়ই এগুলো কোনো রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিপর্যয় নয়; বরং তা পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্যই বিপর্যয়।

যে জাতি বছরের পর বছর অন্য জাতিকে শাসন করে এসেছে আজ সেই জাতিকেই অন্যদের হাতে শাসিত হতে হচ্ছে!

যে জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের শিরদ্বারা উঁচু রেখেছে আজ তারাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সামনে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে!

যে জাতি যুগের পর যুগ মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দিয়েছে, মানুষের কাছে উত্তম চরিত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, তাদেরকে হাতে ধরে আল্লাহ তাআলার পথে নিয়ে গেছে; পরবর্তীতে তারাই ভুলে গেছে সত্য পথের পরিচয়!

তাদের ঘিরে ধরেছে নানান বিপদাপদ এবং বিপর্যয়।

আমি অর্ধেক সমাধানে সন্তুষ্ট নই। পরিস্থিতি শান্তকরণেও খুশি নই। অস্থায়ী সাফল্য পেতেও রাজি নই।

আমরা চাই না (নীলনদে) সকল জাহাজকে নির্গমনের সুযোগ দেওয়া হোক।

আমরা রোগের প্রকৃত কারণের সমাধান ব্যতীত শুধু তাপ নিষ্ক্রিয় করতে চাই না।

আমরা চাই না আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দেওয়া স্লোগান, উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ এবং কারও সাজানো খিঁচুনি।

আমরা আমাদের ভুলগুলোকে, আমাদের সমস্যা এবং দুশ্চিন্তাগুলোকে কোনো শাসক অথবা আলেম অথবা দাঈ অথবা কোনো বন্ধু অথবা কোনো শত্রুর উপর চাপাতে চাই না।

আমরা আমাদের রোগের কারণসমূহ গভীরে গিয়ে বুঝতে চাই এবং তার শরিয়তসম্মত চিকিৎসা কামনা করি।

বিশ্বাসের ত্রুটি থেকেই মানুষের চিন্তা-চেতনাতে সমস্যা তৈরি হয়। আমাদের বিশ্বাসের ত্রুটি হলো, ইসলামের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির ব্যাপারে বিরাট বড় ভুল উপলব্ধির সৃষ্টি।

উম্মাহর সন্তানদের মাঝে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন রকম ভুল চিন্তা-চেতনা। তবে আল্লাহ যাকে দয়া করেন সে এর থেকে নিরাপদে রয়েছে।

এখন সমাধান হচ্ছে, ইসলামের মূল উৎসধারা উপলব্ধি করে প্রকৃত ইসলামি চিন্তা-চেতনার দিকে ফিরে আসা।

যেমন ইরাকের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে আপনি এ ধরনের মতামতগুলো পাবেন–

দেখা যাবে, কেউ কেউ বলছেন—সাদ্দাম হোসেনের জন্য উচিত হচ্ছে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া।

আবার কেউ কেউ বলছেন, যখন থেকে পরিস্থিতি অবনতির দিকে গড়িয়েছে তখন থেকেই আরব দেশগুলোর জন্য উচিত ছিল শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে হাঁটা।

অন্য আরেকজন বলছেন, উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

কেউ বলছেন, আমেরিকার জন্য উচিত হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব এ সমস্যার সমাধান বের করা।

আর কারও কারও মত হচ্ছে, ইরাকের জন্য তাদের নিজেদের সকল অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করে ফেলা কর্তব্য।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথাও বলে, আমেরিকার সামনে টিকে থাকতে হলে মুসলমানদের জন্য উচিত

হচ্ছে, চীন, জার্মানি, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।

আরেকদল ইরাকের মধ্যে মানবব্যূহ তৈরি করতে চায়।

যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে ইরাকে অবস্থান করতেন তাহলে তিনি কি এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করতেন?

আমরা চাই যে, আল্লাহ তাআলার শরিয়তের মূলভিত্তি অনুযায়ী সকলের চিন্তা-চেতনা যেন এক হয়ে যায়। আর এই ঐক্যবদ্ধ চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তান, প্রিয়জন, প্রতিবেশীদের মাঝে এবং আমাদের সমাজে কাজ করে যেতে চাই।

আমরা যে সকল চিন্তা-চেতনা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে খুঁজে পাই সে সকল চিন্তা-চেতনাকে আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই।

উম্মাহ আজ যে সকল চিন্তা-চেতনার মুখাপেক্ষী

আমি এখানে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনীয় কিছু চিন্তা-চেতনার কথা উল্লেখ করব। প্রতিটি মুসলমানের এ সকল চিন্তা-চেতনার বাহক হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। চাই সে শাসক হোক বা প্রজা, আরব হোক বা অনারব, কাছের হোক বা দূরের; চাই সে কোনো স্বাধীন মুসলিমরাষ্ট্রে বসবাস করুক কিংবা পরাধীন রাষ্ট্রে।

মোটকথা, প্রত্যেক ওই মুসলিম যিনি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসুল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট তার প্রতি আমার এই আহ্বান।

প্রথম চিন্তা-চেতনা

যে কথার মাধ্যমে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করেছি তা হলো, আমরা আবরাহার যুগে নই। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের জন্য একটি নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন। তা হচ্ছে, তিনি বলেছেন,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য

করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।" [২৬]

বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলার শরিয়তের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তার সাহায্য অবতীর্ণ হবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, শরিয়তের বাস্তবায়ন হচ্ছে শাসকের দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবতা হলো, শরিয়তের বাস্তবায়ন তিন স্তরে হয়ে থাকে। এটি ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। শরিয়তের বাস্তবায়নে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভূমিকা রয়েছে।

প্রথম স্তর
ব্যক্তিকেন্দ্রিক

* শরিয়ত বাস্তবায়ন-এর অর্থ হলো, সকল কাজে আল্লাহ তাআলার অনুগত থাকা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।

* শরিয়ত বাস্তবায়ন তথা নামাজ, রোজা, হজ এবং জাকাত আদায় করা।

* শরিয়ত বাস্তবায়ন অর্থাৎ সুদ প্রভৃতি লেনদেন না করা।

---

[২৬]. সুরা মুহাম্মদ : ৭

* শরিয়ত বাস্তবায়ন অর্থাৎ পর্দার বিধান মেনে চলা।

* শরিয়ত বাস্তবায়নের মানে হচ্ছে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ রাখা এবং পথের অধিকারের সংরক্ষণ করা।

এমন আরও অনেক শরয়ি হুকুম আছে যেগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব ব্যক্তির উপর। শাসকের উপর নয়।

দ্বিতীয় স্তর

সমাজকেন্দ্রিক

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।

* আপনি আপনার ঘরে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

* আপনি যদি শিক্ষক হন তাহলে আপনার ছাত্রদের সাথে শরিয়ত বাস্তবায়ন করতে পারেন। প্রধান কর্মকর্তা হলে আপনার অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে শরিয়ত বাস্তবায়ন করতে পারেন। আর ব্যবসায়ী হলে আপনার গ্রাহকদের সাথে শরিয়ত বাস্তবায়ন করতে পারেন।

এমন আরও অনেক সামাজিক বিষয় আছে যেখানে আমরা শাসককে ছাড়াই শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারি। যেমন : আপনি আপনার সাধ্য অনুযায়ী সৎ কাজের প্রতি আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, বিশৃঙ্খলায় বাধা দেওয়া, ঘুষের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দালালির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারেন।

তৃতীয় স্তর

শাসককেন্দ্রিক

এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য শাসকের বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যেমন : হদ তথা শাস্তি বিধান, জিহাদের লক্ষ্যে সৈন্য পরিচালনা, কর এবং টোল উত্তোলন, মদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, পাপাচার এবং অশ্লীল নাটকের বিনোদন-ব্যবস্থা বন্ধ করা, মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন রুখে দেওয়া এবং শুধু মুমিনদের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপনকেই যথেষ্ট মনে করা।

যখন কিনা মুসলমানরা তাদের সাধ্যের সীমানাতেই শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করছে না, তখন তারা কীভাবে আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়ার আশা করতে পারে?

এটা আল্লাহ তাআলার রীতি বিরোধী। আর আল্লাহ তাআলার অপরিবর্তনীয় এবং স্থায়ী নীতি হচ্ছে,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।"[২৭]

দ্বিতীয় চিন্তা–চেতনা

নিশ্চয়ই মুসলিম জাতি এমন এক জাতি, যারা ধ্বংস হওয়ার নয় এবং কখনোই ধ্বংস হবে না।

এটি হচ্ছে একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও চেতনা। যখন মুসলমানগণ একেবারেই হতাশ হয়ে পড়বে, উঠে দাঁড়ানোর কোনো আশা থাকবে না তখনও তাদের জন্য এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, সর্বশেষ ক্ষমতার লাগাম মুসলমানদের হাতেই থাকবে। মুসলিম জাতি কখনো ধ্বংস হবে না। পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন মুসলিম জাতির অস্তিত্ব থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

"কোন রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না"।[২৮]

---

২৭. সুরা মুহাম্মদ : ৭

২৮. সুরা ইসরা : ১৫

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোনো রাসুল আসবে না। তাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজীবের মধ্য হতে সর্বশেষ রিসালাত বহনকারী জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকার বিকল্প নেই। তা না হলে সৃষ্টিজীবের উপর আল্লাহ তাআলার প্রমাণাদি কারা প্রতিষ্ঠিত করবে? কারা লোকদের হাত ধরে তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার পথে নিয়ে আসবে? কারা মানুষকে শেখাবে তার জীবনের লক্ষ্য কী? কারা মানুষকে দেখিয়ে দেবে তাদের প্রভুর ইবাদতের পদ্ধতি? দুনিয়া আবাদ করা, শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা, অত্যাচার দূরীভূত করা, হক আদায় করা, ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবায়ন করা এবং দয়ার দিকে কারা মানুষকে পথ দেখাবে?

নিশ্চয়ই মুসলমানদের টিকে থাকা একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে প্রচুর প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের জন্য এগুলো অনুধাবন করার বিকল্প নেই। কিন্তু একটি বিষয় থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্ক হওয়া উচিত।

পরিবর্তনের ধারা থেকে সতর্ক হোন...

যদিও আল্লাহ তাআলার নিয়ম হচ্ছে তিনি অমুসলিম অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করে দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিমদের উপরে একটি বিশেষ নিয়ম বহাল রেখেছেন। তা হচ্ছে পরিবর্তনের ধারা। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ভ্রষ্ট প্রজন্মকে ধ্বংস করেন এবং সৎ প্রজন্মকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। যে প্রজন্ম নির্জীব তাদের বদলে তিনি জিহাদ, আন্দোলন, শ্রম এবং দানের প্রতি আগ্রহী প্রজন্মকে সৃষ্টি করেন। এটাই আল্লাহ তাআলার অবধারিত রীতি।

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হবার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধরো? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার

জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি তোমরা বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আজাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান"।[২৯]

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ﴾

"যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না"।[৩০]

তাই পরিবর্তনের এ ধারা থেকে সতর্ক হোন।

---

[২৯]. সুরা তাওবা : ৩৮, ৩৯
[৩০]. সুরা মুহাম্মদ : ৩৮

তৃতীয় চিন্তা-চেতনা

মুমিনদের প্রতি শত্রুতাপোষণকারী অত্যাচারী সম্প্রদায় অবধারিতভাবে ধ্বংস হবে।

এটিও আল্লাহ তাআলার অবধারিত এক রীতি। তিনি বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾

"এতেও কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়ি-ঘরে তারা বিচরণ করে। নিশ্চয়ই এর মাঝে নিদর্শনাবলি রয়েছে। অতএব, তারা কি শুনবে না?"[৩১]

আমেরিকান সম্প্রদায় যদি তাদের নীতি ও পন্থার উপর অটল থাকে তাহলে তারা যে ধ্বংস হবে এটা নিশ্চিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেননা, আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র গ্রন্থে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের চিত্র বর্ণনা করে এর পেছনে যে সকল কারণ উল্লেখ করেছেন তার সবকটিই আমেরিকা নিজের মধ্যে একীভূত করেছে। এই জাতি ইতিমধ্যেই তাদের নামের সাথে অহংকার, অত্যাচার ও

---

[৩১]. সুরা সাজদাহ : ২৬

বিলাসিতার বিশেষণ যুক্ত করেছে আর নিমজ্জিত হয়েছে পাপের দরিয়ায়। তারা আক্রান্ত হয়েছে দম্ভ এবং জাতিগত বৈষম্যের রোগে। এ সকল ত্রুটি সাথে করে কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। বিষয়টি মুসলমানদের গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত।

আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত ইসলামি মূলনীতির প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ রাখা। তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণা—

﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

"শহরের কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাকে দ্বিধায় না ফেলে। তাদেরকে সামান্য ভোগ-বিলাস দেওয়া হয়েছে, অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তা কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা"।[৩২]

[৩২]. সুরা আল-ইমরান : ১৯৬-১৯৭

চতুর্থ চিন্তা-চেতনা

ব্যর্থতা হচ্ছে ঝগড়া-ফাসাদের মিত্র। কোনো বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত জাতির জন্য সাহায্য অবতীর্ণ হবে না।

তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

"তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের প্রভাব দূর হয়ে যাবে। বরং তোমরা ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন"।[৩৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثًا﴾

"তোমরা ওই মহিলার মতো হয়ো না, যে পরিশ্রম করে সুতা বুনার পর তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে"।[৩৪]

---

[৩৩]. সুরা আল-আনফাল : ৪৬
[৩৪]. সুরা নাহল : ৯২

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো; বিচ্ছিন্ন হয়ো না"।[৩৫]

আরেক আয়াতে বলেন,

﴿وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ﴾

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে"।[৩৬]

এ শুধু ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়; বরং ইসলামি সমাজেরও দায়িত্ব।

যখন মুসলমানগণ একই ছাদের তলে বসবাস করে কোনো কল্যাণের কাজে একতাবদ্ধ হতে পারে না, তখন তারা কীভাবে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর ঐক্য কামনা করে?

বর্তমানে মুসলমানরা তাদের নানাবিধ বিষয়ে, রাস্তা-ঘাটে, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এবং জনকল্যাণকর

---

[৩৫]. সুরা আল-ইমরান : ১০৩
[৩৬]. সুরা আল-ইমরান : ১০৫

কাজে; বরং কখনো কখনো মসজিদেও একতার চেতনার উপলব্ধি করে না।

কখনো কখনো মুসলমানরা মসজিদের ইমামের দায়িত্ব নিয়েও ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং তারা যে জাতির নেতৃত্ব নিয়েও বিবাদে লিপ্ত হবে না, এর কি নিশ্চয়তা আছে? যখন পরিস্থিতি এমন অবনতির দিকে নেমে এসেছে, তখন মুসলিম জাতির মাঝে ঐক্য কীভাবে হবে আর কীভাবে তাদের কাছে সাহায্যের আগমন ঘটবে?

আমার দ্বীনি ভাই ও বোনেরা...

- আপনাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি থেকে বেঁচে থাকা। কেননা শয়তান একজনকে ধোঁকা দিতে পারলেও দুইজনের ক্ষেত্রে সে তুলনামূলক দূরত্বে অবস্থান করে।
- যে ব্যক্তি জান্নাতের সৌন্দর্য কামনা করে সে যেন জামায়াত তথা দলবদ্ধ হয়ে থাকাকে আঁকড়ে ধরে।
- আপনারা পরস্পর আত্মীয়তা ছিন্ন করবেন না, একে অপরের পেছনে লেগে থাকবেন না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবেন না, পরস্পরে হিংসা করবেন না, আপনারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বান্দা হয়ে যান। কোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইকে তিনদিনের বেশি পরিত্যাগ করা জায়েয নেই।
- আপনাদের জন্য হিংসা থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। কেননা হিংসা নেককাজগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে, যেমনিভাবে আগুন কাঠকে ধ্বংস করে দেয়।
- আপনারা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকবেন, কেননা ধারণা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা।
- আপনাদের জন্য উচিত হচ্ছে পরস্পরের অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত থাকা, কেননা তা ধ্বংসাত্মক।

- আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকা, কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন ভীষণ অন্ধকার রূপ ধারণ করবে।
- এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তাকে অত্যাচার করবে না এবং তাকে উত্যক্ত করবে না।
- এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তাকে অপদস্থ করবে না এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না।
- একজন মানুষের অনিষ্টের জন্য তার উপর মুসলিম ভাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাই যথেষ্ট।
- প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম এবং সম্পদ হারাম।
- যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন।

পঞ্চম চিন্তা-চেতনা

আপনার দেহের চামড়া আপনার নখের মতো করে কেউ চুলকাতে পারবে না। তাই আপনার সকল দায়িত্বভার আপনিই গ্রহণ করুন।

মুসলমানদের বুঝা উচিত যে, সাহায্য বাহিরের রাষ্ট্র থেকে আসার মতো জিনিস নয়।

হে আমার দ্বীনি ভাই, প্রকৃতপক্ষে আসল সাহায্য হচ্ছে দেশীয় পণ্যের নাম। তার উপরে মেড ইন চায়না তথা চীনে তৈরি, অথবা মেড ইন ফ্রান্স কিংবা মেড ইন

আমেরিকা ইত্যাদি ট্যাগ যাতে না থাকে। বরং তার উপরে স্পষ্ট ভাষায় লেখা থাকবে, "মুসলিম রাষ্ট্রের তৈরি, মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে তৈরি"।

সাহায্য আমদানি করার মতো জিনিস নয়

ইরাকের মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ফ্রান্সকে ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু ভালো করে জেনে রাখুন, ফ্রান্স এ কাজ ইরাকবাসীদের চক্ষু শীতল করার জন্য করেনি। তারা এ কাজ করেছে হিংস্র, পিশাচ আমেরিকার মোকাবিলায় ফ্রান্সের প্রভাবকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য।

আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, লেবানন এবং তারও আগে মিসরে ফ্রান্স যা করেছে তা ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই।

মনে রাখবেন, ফ্রান্সের রয়েছে লম্বা কালো হাত। আজও আলজেরিয়ার চলমান বিশৃঙ্খলায় ফ্রান্সের সেই হাত কাজ করে যাচ্ছে।

ভুলে যাবেন না, আলজেরিয়াতে আরব এবং বার্বারিয়ানদের মাঝে যুদ্ধের আগুন ফ্রান্সই প্রজ্বলিত করেছে।

বিস্মৃত হবেন না, তারা দুজন মুসলিম যুবতিকে তাদের স্কুলে পর্দার বিধান পালনে বাধা প্রদান করেছে।

কিন্তু প্রত্যেকেই মন্দ দিকগুলো এড়িয়ে শুধু তাদের ভালো দিকগুলোই দেখে।

হ্যাঁ, আমরা তাদের মিত্রতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে উপকৃত হই তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা কখনোই ফ্রান্সের কাছ থেকে নিঃস্বার্থ সাহায্যের প্রত্যাশা রাখি না।

বীরত্বের সাথে ইরাকবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাশিয়াকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু আপনাদের কাছে আমার প্রত্যাশা হলো, আপনারা চেচনিয়ার ভাইদের কথা ভুলে যাবেন না। আফগানিস্তানে কয়েক বছর ধরে যা ঘটেছিল তা ভুলে যাবেন না। আর গুরুত্বের সাথে লক্ষ করবেন খুব দ্রুতই মুসলিম রাষ্ট্র দাগিস্তানে কী ঘটনা ঘটতে চলছে?

আমরা জাতিসংঘকেও ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু ভুলে যাবেন না, এই জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের সাথে কী করেছিল? ১৯৪৭ সালে তারা ফিলিস্তিনকে অন্যায়ভাবে দুই ভাগ করে ইসরাইল এবং আরবদের মাঝে বণ্টন করে দেয়। ভুলে যাবেন না জাতিসংঘের অপমান, লাঞ্ছনা, ধোঁকা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা। ভুলে যাবেন না তাদের দুই পাল্লায় পরিমাপের কথা। অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে নিপীড়িতদের শাস্তি দেওয়ার কথা।

এমনিভাবে ইরাকবাসীদের মুক্তির জন্য খ্রিষ্টানদের পোপের কাছে সহযোগিতা কামনা করা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। যেখানে কি-না ইরাকের ছিয়ানব্বই শতাংশ জনগণই মুসলিম।

এ কথা কোনাভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, খ্রিষ্টান পোপ আমেরিকার খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে গিয়ে ইরাকের মুসলমানদেরকে সাহায্য করবে। এটা যেমন ধর্ম সমর্থিত নয়, তেমনি যুক্তি সমর্থিতও নয়।

হে আমার দ্বীনি ভাইয়েরা...

সাহায্য হচ্ছে মূলত দেশীয় পণ্যের নাম। কোনো বাহিরের রাষ্ট্র থেকে তা আমদানি করা ঠিক নয়।

আর মনে রাখবেন, আপনার দেহের চামড়া আপনার নখের মতো করে কেউ চুলকানোর ক্ষমতা রাখে না। তাই যা করার আপনাকেই করতে হবে।

ষষ্ঠ চিন্তা-চেতনা

যেমন কর্ম করবেন তেমন ফল পাবেন।

অধিক পরিমাণে শাসকদের দোষ চর্চায় লিপ্ত হবে না। নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে শুধু তাদের কাঁধেই ক্লান্তিকর কাজসমূহ চাপানোর অভ্যাস পরিহার করুন।

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, দায়িত্ব যদি বড় হয় তাহলে ক্লান্তিও বেশি হয়। আর যে ব্যক্তি একজনের ক্ষেত্রে ভুল করে, সে দশজনের ক্ষেত্রে ভুলকারীর সমান নয়;

জাতির হকের ক্ষেত্রে ভুলকারীর মতোও সে নয়। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতাকে স্মরণে রাখতে হবে যে, "যেমন কর্ম করবেন তেমন ফল পাবেন"।

নিশ্চয়ই শাসকগণ সাধারণত জনগণের কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখেন। কোনো সৎ জাতির উপরে কোনো ভ্রষ্ট শাসককে চাপিয়ে দেওয়া আল্লাহ তাআলার রীতি নয়। আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র গ্রন্থে ফেরআউনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ﴾

"অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়"।[৩৭]

তিনি একথা বলেননি যে, ফেরআউন পাপাচারী ছিল। সুতরাং জনগণ এবং শাসকদের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যদি আপনারা নিজেদের সংশোধন করতে পারেন, তাহলে আপনাদের মধ্য থেকেই খালিদ, মুসান্না, তারিক, কুতুজ এবং সালাহউদ্দিনের মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হবে।

---

[৩৭]. সুরা যুখরুফ : ৫৪

সপ্তম চিন্তা-চেতনা

মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকার ষড়যন্ত্রগুলো পূর্বনির্ধারিত।

এই ষড়যন্ত্র সাদ্দাম হোসাইন বা মোল্লা ওমর রহ.-এর মতো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কারণে নয়। মুসলমানদের অস্ত্রাগার ধ্বংস প্রভৃতি কারণেও নয়। নিশ্চয়ই ইরাকের ভূখণ্ডে আমেরিকার আগমন একটি পুরোনো এবং পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা। এমনিভাবে আফগানিস্তান এবং ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশীয় অঞ্চলে আমেরিকার আগমন, এটিও একটি পুরোনো এবং পূর্বনির্ধারিত বিষয়।

এখানে কথা হচ্ছে, তারা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, মিত্রপক্ষকে খুশি করা এবং জনগণকে চুপ করানোর জন্য কোনো না কোনো অজুহাত বানিয়ে নেয়।

কখনো কখনো পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে কোনো পরিকল্পনাকে অগ্রগামী করা হয় এবং অপরটিকে পিছিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু সকল পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই প্রস্তুতকৃত। আর আমেরিকার আপন ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামি বিশ্বের পুনর্গঠন এবং বিন্যাসের অভিপ্রায় এমন একটি বিষয় যা কারও কাছেই অস্পষ্ট নয়।

এরপরও কি তারা তাদের হীন পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করবে না?

"সাদ্দামের কি সরে যাওয়া উচিত নয়"-এ মর্মে এক বিখ্যাত জাতীয় পত্রিকার সম্পাদক যে স্লোগান তুলেছেন তারা কি তা কাজে পরিণত করে দেখাবে না? আমেরিকার কাছে দূত পাঠিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের রক্ত হতে হাত গুটিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন করে তাদেরকে অতি দ্রুত এ কাজের বাস্তবায়ন করার কথা বলবে না?

নিশ্চয়ই আমেরিকার কাছে নিরাপত্তা চাওয়া আর বকরি পালের জন্য নেকড়ের কাছে নিরাপত্তা চাওয়া এক সমান।

অষ্টম চিন্তা-চেতনা

মুসলিম জাতি অধিকাংশের মালিক হবে।

কেউ যেন এ কথা বিশ্বাস না করে যে, মুসলিম জাতি একটি অক্ষম জাতি। উত্তর কোরিয়ার মতো একটি নিঃস্ব এবং হতদরিদ্র রাষ্ট্র যেখানে আমেরিকার সামনে দাঁড়িয়ে যেতে পারে সেখানে মুসলমানরা কিছুই করতে সক্ষম হবে না, এমনটি কোনোভাবেই শরিয়তসম্মত নয় এবং যুক্তিগ্রাহ্যও নয়।

মুসলিম বিশ্বের তুলনায় উত্তর কোরিয়ার কী ক্ষমতা আছে?

সেখানকার ৩০ মিলিয়ন নাগরিকই সাম্যবাদী এবং নাস্তিক। আর সারাবিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে এক শত ত্রিশ কোটিরও বেশি।

উত্তর কোরিয়ার আয়তন মাত্র এক লক্ষ বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার! অর্থাৎ তা মিশরের আয়তনের দশভাগের এক ভাগ মানে মিশরের তিনটি জেলার সমান হতে পারে!!

কোরিয়ার প্রায় ৪ থেকে ৬ লক্ষ জনগণ ক্ষুধার কষ্টে মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন থাকে। উত্তর কোরীয় অনেক জনগণ এতটাই দারিদ্র্য এবং নিঃস্ব যে, তারা অনেক সময় শ্যাওলা ও ভেষজ গুল্মলতা খেয়ে জীবনযাপন করে।

পক্ষান্তরে যদি আমরা মুসলমানদের অবস্থা লক্ষ করি, তাহলে তাদের বিভিন্ন ক্ষমতার কথা তুলে ধরতে পারব। যথা : তাদের রয়েছে অর্থনৈতিক, মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভৌগোলিক এবং কৌশলগত সম্ভাবনার ক্ষমতা। আর এ সবকিছুর উপরে হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষমতা—যা অন্য কোনো জাতির নেই। তা হলো,

> "আল্লাহ তাআলা আমাদের অভিভাবক আর তাদের কোনো অভিভাবকই নেই"।

তাহলে উত্তর কোরিয়া যদি অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারে, আমরা কেন তা পারব না?

উত্তর কোরিয়া যদি তাদের শির অবনত করাকে মেনে নিতে না পারে, তাহলে বিলিয়নের অধিক মুসলিম জাতি কেন নিজেদের মাথা নত করে নেবে?

এটা আমাদের চেতনার প্রশ্ন। আমাদের সংকল্প এবং দৃঢ়তার প্রশ্ন।

মুসলমান জনগণের কী করা উচিত?

মুসলমান জনগণের যে কাজগুলো করা উচিত তা হলো,

১. স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক জনমত গ্রহণ (পত্র আদান-প্রদান, ইন্টারনেট, সভা-সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও শরয়ি নীতি মেনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মিছিলের মাধ্যমে)। এ সকল পদ্ধতিতে আপনি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করবেন। যাকে শেখাতে পারেন তাকে শেখাবেন। এই ধর্মের মাধ্যমে সম্মানিত এবং সমৃদ্ধ হওয়ার একটি সাধারণ পরিবেশ গড়ে তুলবেন। এমনিভাবে নেতৃত্বের আশা, জিহাদের প্রতি আগ্রহবোধ এবং শহিদ হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এ সকল কাজের বিনিময়ে অচিরেই অসামান্য ফলাফল আসবে। মুসলমানদের অন্তরে জন্ম নেবে সাহসিকতা এবং দ্বীনের শত্রুদের অন্তরে গেঁথে যাবে ভীতি।

২. ইহুদি, আমেরিকা এবং ইংরেজদের সকল পণ্য বর্জন করা। এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তাদের কাছ থেকে কোনো বস্তু ক্রয় করা গুনাহ, ভ্রান্তি এবং অপরাধ। এ কথা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, যারা আমাদের ভাইদের, মায়েদের, শিশুদের এবং

বৃদ্ধদের রক্তপাত করে তাদের সাথে আমরা বেচাকেনা ও লেনদেন করব। নিশ্চয়ই এমনটি হবে বুদ্ধিহীনতা এবং অদূরদর্শিতার পরিচয়। আর প্রতিরোধের পদ্ধতি হিসেবে শত্রুপক্ষের পণ্য বর্জন করা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়।

যারা শত্রুদের পণ্য পরিহার করেন না, তাদের প্রতি লক্ষ করে আমি একটি বাস্তবচিত্র তুলে ধরছি। ২০০৩ সালে আমেরিকা জার্মানির পণ্যসমূহ বর্জন করে। যার মাধ্যমে জার্মানির বাৎসরিক বিশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় হতো। তারা ফ্রান্সের পণ্যও বর্জন করে। এর কারণ ছিল ইরাকের বিষয়ে জার্মানি এবং ফ্রান্স মার্কিন রাজনীতির বিরোধিতা করেছিল।

আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্যরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস এর (ফ্রান্স থেকে উদ্ভূত আলুর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত একটি খাবার) নাম পাল্টে ফ্রি ফ্রাইস রাখার প্রস্তাব জানায়। যদিও এটি ছিল সামান্য একটি নাম মাত্র। আর আলু শুধু ফ্রান্সেই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কংগ্রেসের সদস্যরা প্রত্যেক ওই বস্তু বর্জনের দাবি জানায়, যার মধ্যে ফ্রান্সের নাম যুক্ত আছে। সেই সূত্রধরেই তারা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের নামও পাল্টে ফেলার দাবি তোলে।

কিন্তু মুসলমানরা আজ কোথায়?

৩. সর্বক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে দায়িত্ব দেওয়া এবং এই বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখা।

এটি এমন একটি পদক্ষেপ, যা গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই। অন্যান্য সকল পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতিটি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

৪. শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটানো। শিশু এবং যুবকদের হৃদয়ে এই চেতনার বীজ বপন করে দেওয়া এবং জনগণের অন্তরে জিহাদ, কুরবানি এবং ত্যাগের মহিমা গেঁথে দেওয়া। তাদের কাছে আমাদের জাতির সুমহান দৃষ্টান্ত পেশ করা এবং সম্ভ্রান্ত ইতিহাস তুলে ধরা। প্রত্যেক পিতা, শিক্ষক, ধর্মীয়পণ্ডিত, লেখক এবং আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমের উপরে এই দায়িত্ব বর্তাবে।

৫. আত্মশুদ্ধি, বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ, চারিত্রিক উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ এবং পরিচ্ছন্ন লেনদেনের পরিবেশ তৈরিতে প্রত্যেকের আপন অবস্থা এবং সাধ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে হাত, মুখ ও অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ রাখতে সচেষ্ট থাকা।

৬. সকল কাজের সুন্দর ফলাফল বের করা এবং অধিক পরিশুদ্ধতা এবং অধিক উপকারী কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া। প্রত্যেকটি কাজকর্মে, পেশায়, কৃষিক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করা।

৭. সকল কাজ সম্পাদনে অনবরত অবনত চিত্তে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা। এটি একটি কার্যকরী মাধ্যম। হজরত আনাস রাযি. বলেছেন,

"দুআ কবুলে আমল সহায়ক হয়।" তাই মনে রাখতে হবে, যারা কোনো আমল করে না, কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মনোযোগী হয় না, উদাসীনতা, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে ডুবে গিয়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের সাহায্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না—আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করেন না।

নবম চিন্তা-চেতনা

আমরা শির বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত একাই লড়াই করে যাব।

আমরা গর্দান ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত লড়াই করে যাব!

রিদ্দাতের ফিতনার সময় এই বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর কণ্ঠে। তিনি এ কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন যে, যদি অন্যরা বসেও থাকে তবুও তিনি তার দায়িত্ব পালন করে যাবেন। যদিও তা এককভাবে হয়।

হ্যাঁ, যদিও আমাদেরকে দলবদ্ধভাবে কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে ক্ষেত্রবিশেষে আমাদেরকে এককভাবেও কাজ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত বিষয়ের ব্যাপারে সে দায়িত্বশীল"।[৩৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾

"তোমরা আমার কাছে এসেছ একাকী, যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম"।[৩৯]

যদি পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান বসে থাকে তবুও আপনি কেন বসে থাকবেন? যদি সৃষ্টিজীবের সবাই অলসতা করে তবুও আপনি কেন অলসতা করবেন? যদি পৃথিবীর সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করে, তাহলে এ কারণে আপনিও কি জাহান্নামে যাবেন?

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা একজনের অপরাধের কারণে আরেকজনকে পাকড়াও করবেন না।

আপনি কখনও অমুক বা তমুকের জন্য কোনো আমল করবেন না।

কোনো বাদশাহ বা রাষ্ট্রপতির জন্য আমল করবেন না।

খ্যাতি বা সুনামের জন্য আমল করবেন না।

সম্পদ বা সাম্রাজ্যের জন্য আমল করবেন না।

---

[৩৮]. সুরা মুদ্দাছ্ছির : ৩৮

[৩৯]. সুরা আল-আনআম : ৯৪

আপনার আমল হবে একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব, অমর, তিনিই প্রথম, তার পূর্বে কেউ অতিবাহিত হয়নি। তিনিই সর্বশেষ, তার পরে আর কেউ নই।

তিনিই আপনার ব্যাপারে অবগত, আপনার হিসাব গ্রহণকারী, তিনিই আপনাকে এক নেকিতে দশ নেকির সাওয়াব দেবেন। আর একটি পাপে শুধু একটি পাপের শাস্তিই দেবেন।

আর আল্লাহ তাআলা অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।

তাহলে কেন থেমে থাকবেন? কেন উদাসীন থাকবেন? কেন অলসতা করবেন?

আপনার পরিপূর্ণ সাধ্য অনুযায়ী আমল করুন। আর এ কথা স্মরণ করুন—আমি আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত দরকার হলে একা একাই লড়াই করে যাব।

দশম চিন্তা-চেতনা

বিলম্ব করা থেকে আপনার বেঁচে থাকা উচিত।

আমি আপনাকে এ কথা বলব না যে, আজকের কাজ কখনই কালকের জন্য রেখে দেবেন না। বরং আমি বলব, আপনি এই মুহূর্তের কাজ পরবর্তী সময়ের জন্য ফেলে রাখবেন না।

এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, প্রত্যেক জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। যখন তার সময় চলে আসবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত করা হবে না এবং এক মুহূর্তও তরান্বিত করা হবে না।

সুতরাং সকালে জেগে উঠে সন্ধ্যার অপেক্ষা করবেন না। সন্ধ্যায় এসে সকালের অপেক্ষা করবেন না।

যদি কোনো দুআ করার ইচ্ছা করেন, তাহলে এখন থেকেই শুরু করে দিন।

যদি কোনো কিছু বর্জন করার ইচ্ছে করেন, তাহলে এখন থেকেই শুরু করুন।

যদি নামাজ, রোজা, জাকাত আদায়ের ইচ্ছে করেন, তাহলে এই মুহূর্ত থেকেই আরম্ভ করে দিন।

যদি আপনার ভাইয়ের সাথে কোনো চুক্তি করতে চান, আত্মীয়তা বজায় রাখতে চান এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে চান, তাহলে এখন থেকেই কাজে নেমে পড়ুন।

যদি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করার ইচ্ছে করেন, সৎ কাজের প্রতি আদেশ দিতে চান এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে চান তাহলে এখন থেকেই শুরু করে দিন।

যদি কোনো বিশৃঙ্খলা, ঘুষের লেনদেন এবং পক্ষপাতিত্ব রুখে দিতে চান, তাহলে এখন থেকেই শুরু করুন।

বিলম্বিত করা থেকে বেঁচে থাকুন। শয়তান কোনো মুমিনকে নেক কাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করে না। তবে সে তাদেরকে ভালো কাজগুলো দেরিতে শুরু করতে বলে। যদি কেউ তার কথা মেনে দেরি করে ফেলে তাহলে দেখা যায় কাজটা তার আর করাই হয়ে ওঠে না।

তাই নিজেকে শয়তানের হাতে সঁপে দেবেন না। কখনও নিজ প্রবৃত্তির অনুগামী হবেন না।

এই হলো আশারাতুন কামিলা তথা পরিপূর্ণ দশটি বিষয়।

যদি আমরা এগুলো নিজে বুঝি, অপরকে বুঝাই এবং এগুলো অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করি তাহলে আমাদের মাঝে এক অমিততেজা প্রজন্ম সৃষ্টি হবে, আমাদের পতাকা সমুন্নত হবে আর আমাদের ললাটে লিখিত হবে সাহায্য, নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা।

সবশেষে বলব...

হে আমার ভাই ও বন্ধু, আল্লাহর পথের সহচর...

মুসলিম জাতির উপর এ ধরনের সংকট এবারই প্রথম আপতিত হয়নি। এগুলো প্রথম আঘাত নয়, প্রথম যন্ত্রণা নয়। এগুলো প্রথম পতন নয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর প্রায় পুরো আরব দ্বীপে ধর্মদ্রোহীতা ছেয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তিনটি শহর এবং গ্রাম এই ফিতনা থেকে মুক্ত

ছিল। এমন লোকেরও প্রকাশ ঘটেছিল, যে দাবি করেছিল তার কাছে ওহি অবতীর্ণ হয় এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর সে-ই এখন নবী।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾

"ওই ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোনো ওহি আসেনি এবং যে দাবি করে যে, আমিও নাজিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাজিল করেছেন"।[৪০]

সেসময় মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং তার সাথে দশহাজার লোক মুরতাদ হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের উপরে (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করার ন্যায় কোনো) পাখির ঝাঁক নেমে আসেনি। পাথরের বৃষ্টিও বর্ষণ করা হয়নি। পরিস্থিতি যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। এরপর মহান আল্লাহ

---

[৪০]. সুরা আন আনআম : ৯৩

তাআলা এমন কিছু লোক প্রেরণ করলেন, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে এবং তিনিও তাদেরকে ভালোবাসেন। যারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি ইস্পাত কঠিন। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করেন না।

খালিদ ইবনে অলিদ রাযি. এবং তাঁর সঙ্গীরা মুসাইলামা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছ থেকে জমিনকে পবিত্র করার জন্য ময়দানে নেমে আসেন।

মুজাহিদদের মাঠে নামার পূর্বে কোনো পাখির ঝাঁক আকাশ থেকে নেমে আসেনি।

৪৯২ হিজরির কথা। ক্রুসেডার বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসে মাত্র একদিনে প্রায় সত্তর হাজার মুসলমানদের হত্যা করে। সেদিন (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করার ন্যায়) কোনো পাখির ঝাঁক নেমে আসেনি। বর্ষিত হয়নি পাথরের বৃষ্টি।

পরিস্থিতি আপন অবস্থায় থেকে যায়। অবশেষে ক্রুসেডারদের কাছ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের জমিনকে পবিত্র করার জন্য মহাবীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহ. এবং তাঁর সঙ্গী মুজাহিদগণ ময়দানে অবতীর্ণ হন।

৬৫৬ হিজরির ঘটনা। তাতারীরা বাগদাদকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে এবং চল্লিশ দিন ব্যাপী সেখানকার হাজার

হাজার লোককে হত্যা করে। কিন্তু সেই অত্যাচারী কাফের তাতারীদের উপর (আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করার ন্যায়) কোনো পাখির ঝাঁক উড়ে আসেনি।

এভাবেই চলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাতারীদের দমনে সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ. এবং তার সঙ্গী বীর সেনানীদের প্রেরণ করেন। এর ফলেই সংঘটিত হয় আইনে জালুতের সেই বিখ্যাত যুদ্ধ। মুমিনদের ললাটে লিখিত হয় সাহায্য এবং বিজয়। বরং এর চেয়ে আরও বেশি কিছু।

শিয়াদের সবচেয়ে উগ্র উপগোষ্ঠী ছিল কারামিতাহ। তাদের উগ্রতার ফলে কোনো কোনো আলেম তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকেই বের করে দেন। তারা মক্কা-মুকাররমায় হামলার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে। ৩১৭ হিজরির আটই জিলহজ তারওইয়ার দিনে তারা মক্কায় এবং হারাম শরিফে প্রবেশ করে মক্কা এবং তার অধিবাসীদের আক্রান্ত করে। হারাম শরিফে অবস্থান নেওয়া প্রত্যেক হাজিগণকে তারা রক্তে রঞ্জিত করে। এমনকি যারা কাবার গিলাফ ধরে ছিল তাদেরকেও হত্যা করে। পবিত্র কা'বার প্রান্তরে হাজিদের গোশতের টুকরা ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে। পৃথিবীর পবিত্রতম ভূখণ্ডে প্রবাহিত হয় রক্তনদী।

তাদের নেতা আবু তাহের সুলাইমান জানাবী (আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করুন) কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল :

> আমি আল্লাহর জন্য, তিনি সৃষ্টি করেন আর আমি তা ধ্বংস করি! (নাউজুবিল্লাহ)।

এতেও সে ক্ষান্ত হয়নি। সে তার অনুগত এক সৈন্যকে পাঠায় হাজরে আসওয়াদকে আপন স্থান থেকে তুলে আনতে। সেই সৈন্য সাথে সাথেই হাজরে আসওয়াদকে আপন স্থান থেকে তুলে আনে। এরপর আবু তাহের পাথরটিকে আকাশের দিকে উঁচু করে ধরে কর্কশ আওয়াজে বলতে থাকে,

কোথায় পাখির ঝাঁক? কোথায় সেই পাথরের বৃষ্টি?

তো সেদিনও কোনো পাখির ঝাঁক নেমে আসেনি। বর্ষিত হয়নি পাথরের বৃষ্টি।

হাজরে আসওয়াদকে তার স্বস্থান থেকে পূর্ণ বাইশ বছরের জন্য সরিয়ে রাখা হয়। ৩৩৯ হিজরির আগে কেউ তা স্বস্থানে প্রতিস্থাপন করেনি।

বাইশ বছর ধরে মুসলমানরা হাজরে আসওয়াদ ছাড়াই হজ পালন করতে থাকে।

সুতরাং বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার অবধারিত রীতি হচ্ছে,

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

> "তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।" [৪১]

আমরা আবরাহার যুগে নই। আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অবস্থান করছি।

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়তের বাস্তবায়ন ব্যতীত আমাদের জন্য কোনো সাহায্য, সফলতা এবং মুক্তি নেই।

আল্লাহ তাআলার দ্বীন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। শরিয়তের নিয়মকানুন সম্পর্কে সকলেই অবগত এবং আল্লাহ তাআলার রীতিসমূহ সুস্পষ্ট প্রমাণিত। যদি মুসলমানগণ এ সব মেনে চলে তাহলে তাঁরা তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল হবেন। আর যদি তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে নিজেদেরকেই পস্তাতে হবে। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন,

﴿مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا﴾

---

[৪১]. সুরা মুহাম্মদ : ৭

"যে ব্যক্তি সুপথপ্রাপ্ত হয় তা তার নিজেরই কাজে আসবে, আর যে ব্যক্তি বিপথগামী হয় তা তারই বিরুদ্ধে যাবে। কোনো ব্যক্তিই অপরের বোঝা বহন করবে না। আর আমি রাসুল প্রেরণ করা না পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেব না"।[৪২]

তাই আমি আপনাদের যা বললাম, তা ভালোভাবে মনে রাখুন। আমার সকল কাজ আল্লাহর কাছে সঁপে দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেন।

।। সমাপ্ত ।।

[৪২]. সুরা ইসরা : ১৫

মুসলিম উম্মাহর আজকের যে দুর্দশা ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতি, এর থেকে উত্তরণের উপায় কী? উম্মাহর মূলোৎপাটনে আগ্রাসী অমুসলিম শক্তিগুলোকে মোকাবিলায় আমাদের করণীয় কী? আমরা শুধুই উপরের দিকে দু'চোখ তুলে তাকিয়ে থাকব আসমানি কোনো সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার জন্য, নাকি নিজেদেরও করার কিছু আছে? অতীতের জাতিসমূহের বেলায় যেমন শত্রুর দমনে নেমে আসত গায়েবি মদদ; তাদের নিজেদের কিছুই করতে হতো না, আমাদের বেলাতেও কি সে রকম নীতি প্রযোজ্য? নাকি চিরাচরিত সেই নিয়মের ভেতরে এসেছে নতুন কোনো পরিবর্তন? এই বইতে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সুলেখক ড. রাগিব সারজানি।

আরবের এই অনুসন্ধিৎসু লেখক তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টিতে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন উম্মাহর মুক্তির পথ। এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপগুলোও তিনি হৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে অত্যন্ত দরদি ভাষায় খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে পেশ করেছেন পাঠকের সামনে। যেন তা সহজেই প্রতিজন পাঠকের ভেতরে নাড়া দেয়, খুলে দেয় বোধের বদ্ধ দুয়ার।

ISBN